প্রথম অধ্যায়

১.১ বরাক উপত্যকার পরিচিতি ঃ সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এবং গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান

১.১.১ প্রাচীন বরাক উপত্যকা

স্বাধীনতার পূর্বে বরাক উপত্যকা সুরমা উপত্যকা নামে পরিচিত ছিল। ইতিহাসবিদ কনকলাল বরুয়া খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের বৌদ্ধগ্রন্থ ও গ্রীক্ ভ্রমণকারীদের বিবরণ অবলম্বনে তাঁর 'আরলি হিস্‌ট্রি অব কামরুপ' গ্রন্থে লিখেছেন, শ্রীহট্ট একসময় ছিল সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে পাণিণি তাঁর অষ্টাধ্যয়ীতে সুরমস নামক যে জনপদের কথা বলেছেন,পণ্ডিতদের অনুমান সেই প্রাচীন সুরমস জনপদই হল সুরমা উপত্যকা এবং সুরমা উপত্যকার অঙ্গ ছিল শ্রীহট্ট জেলা। ১৮৭৪ সালে গভর্নর জেনারেল নর্থ ব্রুকের সময়ে ব্রিটিশরাজশক্তি শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার জন্য Schedule District Act,XIV অনুসারে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও কিছু পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে স্বতন্ত্র আসাম প্রদেশ গঠনের সময়ে রাজস্ব বৃদ্ধির প্রয়োজনে বঙ্গভুমির অঙ্গ শ্রীহট্ট জেলাকে বঙ্গদেশ থেকে সরিয়ে এনে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে। স্যার এডওয়ার্ড গেইটের মতে—

"Although sylhet may at times have formed part of the ancient kingdom of Kamrupa it was never during the historical period included in Assam...... But when the Chief Commissionership of Assam was created.. Sylhet was incorporated in the new province." [১]

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও পার্বত্য অঞ্চলের সঙ্গে সার্বিক ভিন্নতার কথা মনে রেখে ভৌগোলিক , সাংস্কৃতিক ও ভাষিক বিচারে অভিন্ন বঙ্গভাষী শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা দুটিকে

নিয়ে সুরমা নদীর নামে সেদিন 'সুরমা ভ্যালি ডিভিশন' নামে একটি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক ইউনিট তৈরি করা হয়েছিল। শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলাকে সে অনুসারে ১৮৭৪ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত 'সুরমা উপত্যকা' বলা হত। তখন সুরমা উপত্যকার প্রশাসনিক অবস্থানে তিনটি পর্যায়ক্রম লক্ষ করা যায়। প্রথমত ১৮৯৪-১৯০৫ সাল পর্যন্ত শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা মুখ্য ন্যায়াধীশের অধীনে ছিল। শিলচর ও হাইলাকান্দি ছিল কাছাড় জেলার অন্তর্ভুক্ত দুটি মহকুমা এবং শ্রীহট্ট জেলার একটি মহকুমা ছিল করিমগঞ্জ।

দ্বিতীয়ত ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের ফলে বাংলার জনমানসে যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ, প্রতিবাদ ও আন্দোলনের ঢেউ উঠেছিল তার জেরে ১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হল। আসাম প্রদেশ একটি গভর্ণর শাসিত প্রদেশে উন্নীত হল। বঙ্গদেশের অঙ্গচ্ছেদ ঘটিয়ে আসাম প্রদেশের সঙ্গে সুরমা উপত্যকা কে আবার জুড়ে দেওয়া হল। বারে বারে শ্রীহট্টের এই বঙ্গদেশে অন্তর্ভুক্তি ও অঙ্গচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্যথিত হয়েছিলেন। তাই ১৯২০ সালে শ্রীহট্ট পরিভ্রমনে এসে তিনি আক্ষেপ করে লিখেছিলেন—

"মমতাবিহীন কালস্রোতে,
বাংলার রাষ্ট্রসীমা হতে
নির্বাসিতা তুমি
সুন্দরী শ্রীভূমি।"

১৯৪৭ সালে শ্রীহট্টের ভাগ্যাকাশে আবারো ঘনিয়ে এল দুর্যোগ। স্বাধীনতা লাভ ঘটল রাজনৈতিক কুটিলাবর্তে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের মাধ্যমে। সুরমা উপত্যকার প্রধান শরিক শ্রীহট্টের অধিকাংশ ভূখণ্ড পূর্বপাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) অন্তর্ভূক্ত হল। All India Congress Committee র ১৯৪৭ সালের ১৪ জুন অনুষ্ঠিত অধিবেশনে পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ দেশবিভাগের প্রস্তাব উত্থাপন করলে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, আসাম প্রদেশের কোনরূপ বিভাজন হবে না। আসামের পুরোটাই ভারত ভূখণ্ডে থাকবে। কিন্তু রাজনৈতিক কুটিল আবর্তে পূর্বসিদ্ধান্ত পাল্টে নতুন সিদ্ধান্ত

গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্তে বলা হয়, শুধু বঙ্গভাষী শ্রীহট্ট জেলাকে আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে গণভোট নেওয়া হবে। গণভোটের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলে সমগ্র জেলা জুড়ে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। বঙ্গভাষী হিন্দু-মুসলিম সেদিন স্লোগান তুলে 'সোনার সিলেট ছাড়ব না, ভাঙ্গা বাঙলায় যাব না'। অবশেষে আসাম সরকার ও মুসলিম লিগের ইচ্ছানুযায়ী ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ জুলাই, সোমবার ও মঙ্গলবার শ্রীহট্টের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য গণভোট সম্পন্ন হল। ভারত ইতিহাসের এই কলঙ্কজনক অধ্যায়টি সরকারি নথিপত্রে 'Sylhet Referendum' নামে পরিচিত।

এই কলঙ্কজনক অধ্যায় সম্পর্কে শ্যামলেশ দাশ বলেছেন—

"প্রশাসনকে কব্জা করে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করার ঘৃণ্য নজির ভারতবর্ষে যে সমস্ত রাজনীতিক রেখে গেছেন তাদের একজন বাঙলার প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দী যিনি কলকাতায় ১৯৪৬ সালের দাঙ্গায় নিজে লালবাজার থানার কন্ট্রোলরুমে বসে দাঙ্গা পরিচালনা করেছিলেন। আর একজন আসামের প্রধানমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলুই সিলেট গণভোটের সময় করেছিলেন।" [২]

শ্রীহট্টের বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি দিয়ে বিভেদের রেখা টেনে দিয়েছিল মুসলিম লিগ। ফলে শ্রীহট্টের ভারতভূক্তির পক্ষে ভোট দিল হিন্দুরা, আর মুসলমানেরা ভোট দিলেন পাকিস্তানভূক্তির পক্ষে। শ্রীহট্টের পাকিস্তানভূক্তিকে নিশ্চিত করার জন্য মুসলিম লিগ ও আসাম প্রদেশ সরকার বৃটিশ প্রশাসনের সঙ্গে যোগসাজস করে প্রায় তিন লক্ষ হিন্দু চা-বাগান শ্রমিককে গণভোটে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত করে। তারা যে ভাবে চেয়েছিল সেভাবেই গণভোট সম্পন্ন হয়। ভোটে ব্যাপক গুণ্ডামি-জালিয়াতি-কারচুপি করে ৫৫,৫৭৮ ভোটের ব্যবধানে চক্রান্তকারীরা জয়ী হয়। ৪,২৩,৬৬০ ভোটের মধ্যে পাকিস্তানভূক্তির পক্ষে যায় ২,৩৯,৬১৯ ভোট এবং ভারতভূক্তির পক্ষে ভোট পড়ে ১,৮৪,০৪১। শ্রীহট্টের সাড়ে বারোটি থানাকে পূর্বপাকিস্হানের অন্তর্ভূক্ত করা হয় এবং ভারতবর্ষের আগেই শ্রীভূমি শ্রীহট্ট দ্বিখণ্ডিত হয়।

উল্লেখ্য যে, দক্ষিণ শ্রীহট্ট মহকুমার সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটাররা ভারতভূক্তির পক্ষে ভোট দিলেও চক্রান্ত করে এই অঞ্চলকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করা হল না। অবশেষে কলকাতায় ভারত ও পাকিস্তানের সীমানা নির্ধারণের জন্য সিরিল র‍্যাডক্লিফের সভাপতিত্বে গঠিত সীমানা নির্ধারণ কমিশনের অধিবেশন বসে। কমিশনের রায় অনুযায়ী করিমগঞ্জ মহকুমার সাড়ে তিন থানাকে (রাতাবাড়ি, পাথারকান্দি, বদরপুর থানা এবং করিমগঞ্জ থানার অর্ধাংশ) ভারতের অন্তর্ভূক্ত করা হল। এই সাড়ে তিন থানা নিয়ে বিভাগ পরবর্তী মহকুমা করিমগঞ্জ কাছাড় জেলার সঙ্গে যুক্ত হল।

ভাষিক,সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক দিক থেকে বিচার করলে বরাক উপত্যকা যে বৃহৎ বঙ্গেরই অংশ একথা নির্দ্বিধায় মেনে নিতে হয়। এই উপত্যকা যে বৃহৎ বঙ্গের অঙ্গ একথা প্রশ্নাতীত। বঙ্গ সংস্কৃতির আওতাধীন এ অঞ্চল সম্পর্কে ড. নীহাররঞ্জন রায় তাঁর বাঙ্গালীর ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন—

"বাঙলার পূর্বসীমায় উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদ, মধ্যে গারো,খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড় দক্ষিণে লুসাই, চট্টগ্রাম ও আরাকান শৈলমালা। গারো-খাসিয়া-জৈন্তিয়া শৈলশ্রেণীর বিন্যাস দেখিলে স্পষ্টতই বুঝা যায়, বাঙলার সীমা এই পার্বত্যদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত।

বরাক ও সুরমা নদীর উপত্যকা তো মেঘনা-উপত্যকারই (মৈমনসিং-ত্রিপুরা-ঢাকা) উত্তরাংশ মাত্র। এই দুই উপত্যকার মধ্যে প্রাকৃতিক সীমা কিছু নাই বলিলেই চলে, এবং এই কারণেই প্রাচীন ও মধ্যযুগে পূর্ব বাঙলার এই কয়টি জেলার-বিশেষভাবে ত্রিপুরা ও পূর্ব মৈমনসিং জেলার-সংস্কার ও সংস্কৃতি এত সহজে শ্রীহট্ট কাছাড়ে বিস্তারলাভ করিতে পারিয়াছিল। এখনও শ্রীহট্ট-কাছাড়ের হিন্দু-মুসলমানের সমাজ ও সংস্কৃতি বাঙালার পূর্বতম জেলাগুলির সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা। শুধু তাহাই নয়, লৌকিক ও অর্থনৈতিক বন্ধনও বাঙলার এই জেলাগুলির সঙ্গে।" [৩]

'আইন-ই-আকবরি' 'রিয়াজ-উস-সালাতিন' প্রভৃতি পারস্য গ্রন্থে শ্রীহট্ট রাজ বঙ্গ দেশের অন্তর্গত বলেই উল্লেখিত আছে। 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে বঙ্গদেশ বলতে

এককালে পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্ট, ময়মনসিং, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলকেই বোঝানো হত। কামরূপরাজ ভাস্কর বর্মণের মৃত্যুর পর এই উপত্যকা কিছুকাল সমতটের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাচীনকালের বিভিন্ন তাম্রপত্রে ও সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে যে ডবাক রাজ্যের উল্লেখ রয়েছে সেই ডবাক রাজ্য সমতটের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমান কাছাড়, উত্তর কাছাড় পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত এই ডবাক রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল। বিভিন্ন ঐতিহাসিকের মতে হরিকেল রাজ্য বলতে প্রাচীনকালে শ্রীহট্টকেই বোঝানো হত। 'রূপচিন্তামনি' ও 'কৃতসার' গ্রন্হ দুটি তে শ্রীহট্ট অঞ্চলকে হরিকেল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

দীনেশ চন্দ্র সরকারও সহমত পোষণ করে লিখেছেন—

"হরিকেল মূলত শ্রীহট্টের নাম এবং শ্রীহট্ট রাজ্যের বঙ্গে বিস্তৃতির ফলে পরবর্তী কালে ওটি বঙ্গেরও নামরূপে ব্যবহৃত হত।" [৪]

পূর্ববঙ্গীয় চন্দ্রবংশের রাজা শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রলিপি থেকে জানা যায় যে, তাঁর রাজ্য পৌণ্ড্রবর্ধনভূক্তি এবং এই ভূক্তির অন্তর্গত একটি মণ্ডল হল শ্রীহট্ট। পৌণ্ড্রবর্ধন বা পৌণ্ড্রবর্ধনভূক্তি বলতে সেই সময় মূলত উত্তরবঙ্গকেই বোঝানো হত।

প্রাচীন বরাক উপত্যকা এককালে কামরূপ ও ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। 'হট্টনাথের পাঁচালি' 'যোগিনীতন্ত্র' 'কামাখ্যাতন্ত্র' ইত্যাদি গ্রন্হে শ্রীহট্টের উল্লেখ রয়েছে। প্রাচীনকালে কামরূপ রাজ্যের সীমানা ছিল বহু বিস্তৃত। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এই বিস্তৃতির উল্লেখ করেছেন এভাবে—

"একসময় কামরূপ রাজ্য অতি বিস্তৃত হইয়াছিল। পূর্বে করতোয়া ইহার সীমা ছিল,আধুনিক আসাম, মণিপুর, জয়ন্তীয়া, কাছাড়, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি ইহার অন্তর্গত ছিল।" [৫]

প্রাচীন বরাক উপত্যকা যে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল তারও অনেক অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্যান বংশীয় ত্রিপুরার রাজারা কিরাতরাজ্যে এসে প্রথমে কপিলা নদীর তীরে ত্রিবেগ নামক স্হানে তাঁদের রাজ্যপাট স্হাপন করেছিলেন।

মহারাজ ত্রিলোচনের সময় পর্যন্ত ত্রিপুরার রাজধানী ছিল ত্রিবেগ। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্রদের মধ্যে রাজ্যপাট নিয়ে মতভেদ দেখা দিলে রাজা দাক্ষিণ ত্রিবেগ ত্যাগ করে বরবক্র (বরাক) নদীর উজানে খলংমা (যা বর্তমানে রাজনগর) নামক স্হানে এসে রাজধানী স্হাপন করেছিলেন। বরাক উপত্যকায় প্রাপ্ত বহু প্রত্নতাত্ত্বিক ভগ্নাবশেষ ও লঙ্গাই, ফাকুয়া, রাজনগর ইত্যাদি স্হান নাম থেকে ত্রিপুরী রাজত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

Allen এর বক্তব্য থেকে করিমগঞ্জ জেলা যে একসময় ত্রিপুরা রাজত্বেরই অংশ ছিল তা অনুমান করা যায়।

"A thousand years ago the karimganj subdivision seems to have been included in the Tippera Kingdom."[৬]

সমতল কাছাড় (বর্তমান কাছাড় ও হাইলাকান্দি জেলা) ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের অধীনে ছিল। ঐতিহাসিক জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্য এর বিবরণ অনুযায়ী —

"From 13th or 14th Century A.D. onwards till the formation of the Koch principality it was included in Tripura." [৭]

কোচ রাজা নরনারায়ণের ভ্রাতা শুক্লধ্বজের সঙ্গে যুদ্ধে ত্রিপুরারাজ বিজয়মাণিক্য পরাজিত ও নিহত হবার পর থেকে কাছাড়ে কোচ রাজত্বের সূত্রপাত ও ত্রিপুরা রাজত্বের অবসান ঘটে। কাছাড়ের শেষ কোচরাজা ভীমসিংহ একমাত্র কন্যা কাঞ্চনীকে উত্তর কাছাড়ের রাজা কীর্তিচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীচন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে তাঁর হাতে সমতল কাছাড়ের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। কাছাড়ে কাছাড়িদের রাজত্বের সূত্রপাত হয়।একসময় কাছাড়ি রাজাদের রাজধানী ছিল বর্তমান ডিমাপুরে এবং সেখান থেকে পরবর্তী সময়ে মাইবং পাহাড়ে। ১৭০৬ সালে কাছাড়ি রাজা তাম্রধ্বজ আহোম রাজা

রুদ্র সিংহর হাতে পরাজিত হয়ে পাহাড় থেকে নেমে এসে বরাক উপত্যকার সমতলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন এবং খাসপুরে রাজধানী পত্তন করেন।

খাসপুরে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আজও পুরাতন দিনের সাক্ষ্য বহন করে। বর্মীদের সাহায্য নিয়ে মণিপুরের মরজিৎ সিংহ কাছাড়ি রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে সিংহাসনচ্যুত করলে গোবিন্দচন্দ্র অবশেষে হরিটিকরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। রাজা লক্ষ্মীচন্দ্রের সময় থেকে শ্রীহট্ট থেকে বাঙালি উপনিবেশ কাছাড়ে গড়ে উঠতে শুরু করে। কাছাড়ের শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যুর দুবছর পর ব্রিটিশরা কাছাড় অধিকৃত করে। এর ঠিক ৬৭ বছর পূর্বে বাংলার নবাব মিরজাফরের আমলে East India Company র বাংলা-বিহার-ওড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর হাতে শ্রীহট্টের ও রাজস্ব আদায়ের ভার চলে যায়। প্রাচীনকালের শ্রীহট্ট-কাছাড় (বরাক উপত্যকা) এভাবে স্মরণাতীত কাল থেকে নানা নামে পরিচিত ছিল, বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে বিভিন্ন রাজ্যের অন্তর্গত হয়েছিল।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শিলচর শহরেই মাস ফসারের স্থায়ী দপ্তর দুধপাতিল থেকে স্থানান্তরিত হয়। শিলচর ইংরেজ শাসনের স্থায়ী কেন্দ্র গড়ে ওঠার সাথে সাথে বরাক উপত্যকায় আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে।

বিশেষত এ সময়ে বরাক উপত্যকার মাটিতে চা গাছের আবিষ্কার-এ উপত্যকার আর্থ-সামাজিক চেহারা সম্পূর্ণ পাল্টে দিল। কৃষি নির্ভর জীবনের সমান্তরালে একটি শিল্প-নির্ভর জীবন গড়ে উঠল। অফিস আদালত স্থাপিত হবার ফলে চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হল। একে একে চা বাগান গড়ে উঠার ফলে বাইরে থেকে শ্রমিকদল যোগ দিল এখানে এসে। আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি হতে থাকল। বরাক উপত্যকায় ডাক বিভাগের উন্নতির জন্য ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে দায়িত্ব নিয়ে এলেন দীনবন্ধু মিত্র। শিলচরে নর্মাল স্কুল স্থাপিত হল ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হল পাবলিক লাইব্রেরি। শিলচর টাউন কমিটি

গড়ে উঠে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে। প্রিন্টিং প্রেস এল ১৮৮৫ তে। ১৮৯৯ তে বরাক উপত্যকার মানচিত্রে সংযোজিত হল রেল চলাচল। এভাবে ধীরে ধীরে আধুনিকতার পথে এগোল বরাক উপত্যকা। বরাক উপত্যকা থেকে প্রকাশিত হতে লাগল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং এই সব পত্র-পত্রিকায় স্থান পেল এই অঞ্চলের কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প যা— এই উপত্যকার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে আধুনিকতার ছোঁয়া নিয়ে এল।

****

১.১.২ বর্তমান বরাক উপত্যকা

বরাক উপত্যকা আসামের দক্ষিণ প্রান্তের একটি জনবহুল এবং গুরুত্বপূর্ণ উপত্যকা। ব্রহ্মপুত্র নদ (প্রাচীন নাম লৌহিত্য) বিধৌত অঞ্চল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা বরাক নদী (প্রাচীন নাম বরবক্র) বিধৌত অঞ্চল বরাক উপত্যকা এবং পাহাড়-পর্বতে ঘেরা অরণ্যময় অঞ্চল পার্বত্য এই তিনটি ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে আসাম রাজ্য গঠিত। আসামের দক্ষিণাংশের তিনটি জেলা কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি নিয়ে যে ভৌগোলিক অঞ্চল তা সম্প্রতি বরাক উপত্যকা নামে পরিচিত। বরাক উপত্যকার পূর্বে মণিপুর রাজ্য, পশ্চিমে বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলা, উত্তরে আসামের উত্তর-কাছাড় পার্বত্য অঞ্চল এবং দক্ষিণে লুসাই পাহাড় ও মিজোরাম রাজ্য। সুহাস চট্টোপাধ্যায় এর মতে বরাক উপত্যকা নামকরণ খুব বেশি পুরোনো নয়।

"The term Barak Valley is of very recent origin, indeed, BarakValley is the post-partitioned undivided Cachar district in Assam."[৮]

বাস্তবিক ১৯৪৭-১৯৮৩ সাল পর্যন্ত এই অঞ্চলের সাধারণ পরিচিতি ছিল কাছাড় জেলা হিসেবে। ১৯৮৩ সালে করিমগঞ্জ মহকুমা জেলাস্তরে উন্নীত হবার পর কাছাড় ও করিমগঞ্জ জেলা দুটি এই ভূখণ্ডের প্রধান নদী বরাকের নামানুসারে বরাক উপত্যকা নামে সাধারণ ভৌগোলিক পরিচয় লাভ করে। এরপর ১৯৮৯ সালে হাইলাকান্দি মহকুমাকে জেলাস্তরে উন্নীত করার ফলে বরাক উপত্যকা নামে ভৌগোলিক পরিচয়টি আরও দৃঢ় হয়। বরাক উপত্যকার ভৌগোলিক আয়তন ৬,৯২২ বর্গ কিলোমিটার, যা আসামের মোট ভূ-খণ্ডের শতকরা ৮.৮২ ভাগ। মোট জনসংখ্যা ২০১১ এর জনসংখ্যা গণনার হিসেব অনুযায়ী ৩৬,১২,৫৮১। শিক্ষিতের হার শতকরা ৬৫ শতাংশ।[৯]

ভূপৃষ্ঠে বরাক উপত্যকার অবস্থান অক্ষাংশ ২৪°৮' উত্তরে এবং দক্ষিণে ২৫°৮' এবং দ্রাঘিমাংশে ৯৩°১৫' পূর্বে ও পশ্চিমে ৯২°১৫'।

এই উপত্যকার গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৫০০ মিলিমিটার। কুশিয়ারা, বরাক, কাটাখাল, ধলেশ্বরী, ধলাই, সিংলা, লঙ্গাই, সোনাই, মধুরা, জাতিঙ্গা প্রভৃতি নদ-নদী এ উপত্যকার উপর দিয়ে প্রবাহিত।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে স্রোত প্রাচীন কাল থেকেই এ উপত্যকায় প্রবাহিত, তা আজও চলেছে। যদিও তেমন তীব্রভাবে কোন সাংস্কৃতিক আন্দোলন এখানে ঘটেনি, তবে বিচ্ছিন্ন ও সাময়িক প্রচেষ্টা সব সময়ই বিদ্যমান। বরাক উপত্যকার রাজ পরিবার এবং পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসকরাই বরাক উপত্যকার শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগৎ-কে বিভিন্নভাবে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন। ইংরেজী মাধ্যম স্কুল বা অন্যান্য স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁরা যেমন উৎসাহ দেখিয়েছিলেন সেই সঙ্গে সংস্কৃত টোল, গ্রন্থাগার, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তার অনেকগুলি আজও আছে।

এ উপত্যকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ৪২৪২টি ও ১০১৭ টি মধ্য বিদ্যালয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে ২৭০ টি এবং উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে ৬১ টি। কারিগরী প্রতিষ্ঠান ও কলেজ রয়েছে ৫৯ টি। প্রাদেশীকৃত সিনিয়র মাদ্রাসা রয়েছে ৪টি, প্রাদেশীকৃত সংস্কৃত টোলের সংখ্যা ৫ টি এবং এবং অল্প কয়েকটি অপ্রাদেশীকৃত সংস্কৃত টোল রয়েছে। এ-ছাড়াও রয়েছে ব্যক্তিগত মালিকানায় বেসরকারি বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়।

বরাক উপত্যকায় ১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়- আসাম বিশ্ববিদ্যালয়। কাছাড়, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি তথা উত্তর কাছাড় ও কার্বিআংলং জেলার কলেজ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ন্তগত এবং এই অঞ্চলে আছে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আছে ৫৯ টি কলেজ। এই ৫৯ টি কলেজের মধ্যে পূর্ব-প্রাদেশীকৃত ১৭ টি ,সদ্য প্রাদেশীকৃত ৩০ টি কলেজ রয়েছে। অন্যান্য কলেজ রয়েছে ১২ টি।

মোট ৫৯টি কলেজের মধ্যে ডিগ্রি কলেজ ৪৭টি বি.এড. কলেজ ৮টি মেডিক্যাল কলেজ ১টি ,ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ১টি, আইন কলেজ ২টি ।

বরাক উপত্যকার তিন জেলায় কলেজের সংখ্যা নিম্নরূপঃ

কাছাড় জেলা	৪০টি
করিমগঞ্জ জেলা	১১ টি
হাইলাকান্দি জেলা	৬ টি

কাছাড় জেলায় একটি মেডিক্যাল কলেজ ও একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে।

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে বিভিন্ন ধরণের কোর্স। কলা-বিজ্ঞান-বাণিজ্য,সদ্য চালু হওয়া গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেসন, কম্পিউটার সায়েন্স, এবং আইনসহ ষোলটি স্কুলের, চৌত্রিশটি বিভাগে বিভিন্ন বিষয়ে পঠন-পাঠন ও গবেষণার কাজ করে চলেছে এই বিশ্ববিদ্যালয়। বরাক উপত্যকার মানুষের আন্দোলনের ফসল এই কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ উপত্যকার শিক্ষাও সংস্কৃতিতে যে যথেষ্ট প্রাণের সঞ্চার করেছে,তা অস্বীকার করা যায় না।

প্রাচীন কালের মত বর্তমান বরাক উপত্যকাও তার বেশ কিছু সুসন্তানের জন্য গৌরব বোধ করতে পারে। দীর্ঘ তালিকা না দিয়ে এখানে বিশিষ্ট কয়েকজন মানুষের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যাঁদের নামের সঙ্গে সমগ্র বরাক উপত্যকা পরিচিত। অরুণ কুমার চন্দ, সতীন্দ্র মোহন দেব, রাজমোহন নাথ, তারাপদ ভট্টাচার্য, প্রমথেশ ভট্টাচার্য, মইনুল হক চৌধুরী প্রমুখ।

শিক্ষা সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক সাময়িক পত্রিকা ও সংবাদপত্র। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই এ উপত্যকায় সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু হয়। সেই ধারাবাহিকতা আজও বজায় রয়েছে। সাংবাদিকতার বিষয়েও এ উপত্যকা পিছিয়ে নেই। অনেক কৃতি সাংবাদিকই ছিলেন এ উপত্যকার সন্তান। জ্যোতিরিন্দ্র নাথ দত্ত, বৈদ্যনাথ নাথ, রবিজিৎ চৌধুরী, হুরমত আলি বড়লস্কর,অচিন্ত্যকুমার ভট্টাচার্য প্রমুখ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বরাক উপত্যকায় একটা সুস্থ ও উচ্চ আদর্শ স্থাপন করে গেছেন।

১.৩ গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের ভূমিকা

১.৩.১ গ্রন্থাগার ও সমাজ

কালস্রোতে সবকিছু হারিয়ে গেলেও গ্রন্থাগার কিন্তু মানুষের জীবনে এক শাশ্বত আলোক উৎস। মানুষের অগ্রগতিতে গ্রন্থাগার এক আলোক দিশারী। তাই তমসাবৃত যুগ পেরিয়ে মানুষ এগিয়ে চলেছে আরো এক আলোকিত সভ্যতার দিকে। এই আবহমান বিশ্ব-সংস্কৃতিতে গ্রন্থাগারের চলমান রূপটিই প্রকাশিত।

মানব সভ্যতার এক বিশাল আকর ভাণ্ডার, যাতে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে তথ্য ও উদ্ভাবনা, ধূসর ও ধূসরতর স্মৃতিসমূহ—বস্তুত মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতি তথা সামাজিক অগ্রগতির ইতিহাসে গ্রন্থাগারের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। একাধারে আদিম ও চিরন্তন, চিরপুরাতন ও চিরনতুন সেই গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব কোন একক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, সুদূর অতীত থেকে আধুনিক কাল, এমন কি, আগামী কালেও সামাজিক বিবর্তনে গ্রন্থাগার সমাজদেহের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবেই বিবেচিত হবে। সভ্যতার প্রয়োজনেই গ্রন্থাগারের উন্মেষ।শিক্ষাই সংস্কৃতির অঙ্গ, জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। জীবন ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশেই গ্রন্থাগারের সামাজিক ভূমিকা স্পষ্টভাবে উচ্চারিত।

প্রথম যখন গ্রন্থাগার সৃষ্টি হয়েছিল তখন মানুষের জীবনে এর প্রভাব এবং উপযোগিতা কতখানি বিবেচিত হবে সে সম্বন্ধে হয়তো গ্রন্থাগারের আদি নির্মাতার কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। কিন্তু নিঃসীম সময়ের স্রোতে এবং পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা আরো দৃঢ় এবং অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্র তার অতীতের একনায়কতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতার দৃঢ় বাঁধন ছিঁড়ে ক্রমশ মানুষের সার্বিক কল্যাণে ব্রতী হয়েছে। অন্ধকার, অত্যাচার, কুসংস্কার এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি একদা মানুষকে অসহিষ্ণু ও অমানবিক করে তুলেছিল। কিন্তু মানুষ তো অন্ধকারের প্রাণী নয় সে আলোক পথচারী।

সুন্দরের তৃষ্ণা তার বুকে। জ্ঞান, প্রজ্ঞা, অহিংসা এবং ভালোবাসার মন্ত্রে সে এক নবযুগের ঋত্বিক। তাই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা থেকে সে সমষ্টি তথা সমাজতন্ত্রের পথে ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে।

দেশ-কালের সীমিত গণ্ডী অতিক্রম করে সে আজ নিজেকে বিশ্বপথিকরূপে চিহ্নিত করতে চায়। এবং মানুষের এই আলোকিত তপস্যার প্রথম ও প্রধান অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সে গ্রন্থাগার থেকে আহরণ করেছে। তাই সভ্য মানুষের জ্ঞানপিপাসার চিরন্তন আধার এই গ্রন্থাগার। মানুষ ও সমাজের মঙ্গল সাধনের জন্যই গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব। আপাতদৃষ্টিতে গ্রন্থাগার একটি স্থিতিশীল বস্তু বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যে একটি সজীব গতিময় সত্তার অস্তিত্ব রয়েছে, কেননা গ্রন্থই মানুষের উপলব্ধির ধারক ও বাহক, গ্রন্থের মাধ্যমেই মানুষের প্রতিভার স্পন্দন অনুভূত হয়। অফুরান প্রাণের ঐশ্চর্য তাই এখানে বদ্ধমূল।

কিন্তু কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের সংঘাত থেকেই যায়, তাই আদর্শের সঙ্গে আকাঙ্খার দূরত্ব বাড়ে। ফলে, না পাওয়ার অতৃপ্তি মানুষকে ব্যথিত করে। গ্রন্থাগার মানুষের আকাঙ্খার একটি আলোকিত রত্নভাণ্ডারের মতো সেখান থেকে একটি একটি করে নিটোল রত্ন তুলে মানুষ নিজেকে সম্পদশালী বলে প্রতিপন্ন করে। কিন্তু বাস্তবে হয়তো বা কখনো কখনো অন্য দৃশ্য দেখা যায়। গ্রন্থাগার এই শব্দটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কখনো কখনো মানুষের সামনে ভেসে ওঠে একটি পুরাতন ভবন, অচ্ছেদ্য অন্ধকার, ধুলোর ঝালর, কিছু পুরাতন আসবাব এবং অসংখ্য জীর্ণ অবিন্যস্ত ও অবহেলিত পুস্তক সম্ভার। এধরণের একটি ম্লান ছবি কি মানুষের চোখে দেখাতে পারে আশার আলো, না তার মনে স্বপ্নের বীজ রোপণ করতে পারে, সুদূর অতীতের কিছু কিছু গ্রন্থাগারের দৈন্যদশা পাঠককে আহত করলেও বর্তমানে তার ছবিটি অত ম্লান এবং অস্পষ্ট নয়। কেননা, মৃত গ্রন্থাগার কখনোই চলমান মানুষের সামনে জীবনের আলোকিত সম্ভার তুলে দিতে পারে না।

আশার কথা, গ্রন্থাগারের অগ্রগতি অব্যাহতই রয়েছে এবং মানুষের সঙ্গে দরদী গ্রন্থাগারিকের আত্মিক যোগাযোগও রয়েছে। বহু শতাব্দী ধরে শিক্ষিত নিরক্ষর নির্বিশেষে মানুষ সমবেত হয়েছে সেই একটি শিরোনামের তলায় যেখানে আশ্রিত প্রচলিত জ্ঞান ও বিজ্ঞান, সব উপাখ্যান ও উপকথা, লোকাচার ও লোকবিদ্যা, সাংসারিক অভিলাষ ও আধ্যাত্মিক অভীপ্সা, সব দ্বন্দ্ব ও সংশয় তাদের সম্ভবপর সমাধান, অন্তর্লীন বিশ্বাস ও বদ্ধমূল ধর্মবোধ,সব সৌন্দর্য ও আনন্দবোধ,সব দুঃস্বপ্ন ও তমিস্রা।

কোন একটা বিশেষ দেশ বা বিশেষ কালের মধ্যে গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব এবং তার প্রভাব সীমাবদ্ধ নয়। সর্বকালের সমস্ত সমাজের অগ্রগতিতে গ্রন্থাগার নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারে সে নিজেকে বিশ্বমুখীন করে তুলেছে। ব্যক্তির চিন্তাকে সমাজে প্রতিফলিত করে, সমাজ থেকে তাকে প্রতিবিম্বিত করেছে সমস্ত দেশে এবং সেই প্রতিবিম্বই প্রসারিত সারা পৃথিবীতে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ, পুস্তক প্রকাশনা, ভিন্নধর্মী পাঠ্যপুস্তকের প্রতি পাঠকের অনুরাগ সৃষ্টি, তথ্য বিস্ফোরণে সজাগ আগ্রহ এবং সর্বোপরি সভ্যতার অগ্রগতিতে সামাজিক প্রতিষ্ঠানরূপে বিশ্বব্যাপী গ্রন্থাগারের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রন্থাগারগুলির পাঠক তথা সামাজিক মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্কের মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সমাজে যে কোন পার্থিব বস্তুর চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও সেই একই উপমার আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। কোন একটি বস্তুর উৎপাদক হল তার স্রষ্টা, দ্বিতীয় ব্যক্তিটি পরিবেশকের ভূমিকায় অবতীর্ণ এবং তৃতীয় জন পণ্যের ক্রেতা বা ব্যবহারকারীরূপে চিহ্নিত। গ্রন্থাগারের উপযোগিতাও ঠিক এইভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। এখানে লেখক এবং প্রকাশক উৎপাদক বা স্রষ্টা, পরিবেশকের ভূমিকা পালন করে গ্রন্থাগার এবং ব্যবহারকারীর ভূমিকায় দেখা যায় পাঠককে। পাঠক ভাল জিনিসের আকাঙ্খা করে। উৎপাদনকারী অর্থাৎ লেখক এবং প্রকাশক মহৎ সৃষ্টিতে

আগ্রহী কিন্তু পরিবেশক তথা গ্রন্থাগার লেখক এবং পাঠকের মধ্যে পরিবেশকরূপে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। বিক্রেতা এবং পরিবেশক সবাই ক্রেতার অন্বেষণে উন্মুখ থাকে, ক্রেতা কিন্তু পরণে পারদর্শী এবং স্বভাবতই উৎকৃষ্ট উৎপাদনের প্রত্যাশী। তাই গ্রন্থাগারিক যদি স্বীয় ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হন, পাঠক কিন্তু সবক্ষেত্রেই বঞ্চিত হন না। কিন্তু শিক্ষিত এবং সচেতন পাঠকের ক্ষেত্রে যা সত্য, অল্প শিক্ষিত এবং শিক্ষার্থী পাঠকের ক্ষেত্রে তা সত্য নাও হতে পারে। এবং সেখানেই দক্ষ গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা অপরিহার্যরূপে প্রতীয়মান হয়।

সামাজিক পটভূমিকায় গ্রন্থাগার দুরকমভাবে সমাজের সেবায় নিয়োজিত থাকে। গ্রন্থাগারের প্রথম কাজ পাঠককে আনন্দদান এবং দ্বিতীয় কর্তব্য শিক্ষার প্রসার।

কথাটি এইভাবে বলা যেতে পারে,আনন্দের মধ্য দিয়ে জীবনমুখী শিক্ষা বিস্তার। সব দেশেই সমাজের সকল স্তরে জ্ঞান ও শিক্ষাকে সমানভাবে বিতরণ করতে উৎসুক. দেশের প্রগতির পথে শিক্ষার এই প্রসার একটি অত্যাবশ্যকীয় পদক্ষেপ। নিরুৎসুক মানুষকে উৎসুক করে তোলা এবং আগ্রহী পাঠককে জ্ঞানার্জনে আরো বেশি উৎসাহী করা আধুনিক গ্রন্থাগারের অন্যতম কর্তব্য হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। তাই এই নুতন পরিবেশে গ্রন্থাগার শুধু জ্ঞানের ভাণ্ডার নয়, জ্ঞানের দিশারীও বটে।

আধুনিক সমাজে স্বপ্ন এবং সাধনা স্বাধীনতাকেন্দ্রিক।আধুনিক সমাজের আদর্শগুলি গণতান্ত্রিক বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং গণতান্ত্রিক চেতনা উন্মেষে স্বাধীনতা শব্দটির একটি বিশেষ তাৎপর্য থেকেই যায়। চিন্তার স্বাধীনতা, জ্ঞানের প্রসারের স্বাধীনতা এবং শিক্ষা বিস্তারের স্বাধীনতা উদার ও সচেতন মানুষের পবিত্র স্বাধীনতার এই বোধটি উজ্জীবিত হতে পারে একমাত্র গ্রন্থাগারের যথার্থ ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে।

গ্রন্থাগারকে বিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠান রূপে না ভেবে তাকে মানুষের সার্বিক মঙ্গলের জন্য সমাজের একটি বিশেষ, অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত করতে হবে। ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ

মরুময় জীবনে মানুষ আনন্দের মরুদ্যান পেতে চায়। জীবনের নিরানন্দ পরিবেশে আনন্দের উপকরণও বড় কম নয়। কিন্তু অন্যান্য উৎস্যগুলির মধ্যে পরিমিতিবোধের অভাব এবং নেহাতই ক্লান্তিকর আনন্দেরই অস্তিত্ব থেকে যায়। সে আনন্দের উপকরণগুলি মানুষের অগ্রগমনে বিশেষ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়।

কিন্তু গ্রন্থাগার মানুষকে যে আনন্দ দেয়, সে আনন্দ সর্বপরিব্যাপ্ত, সৃজনধর্মী এবং চেতনা উন্মেষকারী। বেতার, দূরদর্শন, এবং চলচ্চিত্রের মাধ্যমে মানুষ আনন্দ আহরণ করে কিন্তু এর ফলে আনন্দদানে গ্রন্থাগারের ভূমিকা গৌণ হয়ে যায়নি। এ যেন হোমাগ্নির পাশে কেরোসিন শিখা। গ্রন্থের আকর্ষণ আদিম আকর্ষণের মতোই দুর্বার। কিন্তু সেখানে আবিলতা নেই, আছে অনাবিল পবিত্র এক আলোকদীপ্তি যা মানুষের মনকে অনির্বচনীয় আনন্দে ভরিয়ে তোলে।

কিন্তু এই অলৌকিক আনন্দের পথে পাঠককে হাত ধরে কে নিয়ে যাবে প্রাত্যহিক তুচ্ছতার অপর প্রান্তে, যেখানে শুধু অসীম আকাশ আর অপরূপ আলোকবন্যা। এ ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিককে কর্ণধারের ভূমিকাটি পালন করতে হবে। যদিও কোন পাঠক গ্রন্থ নির্বাচনে ব্যক্তিগত রুচি এবং আবেগের দ্বারাই পরিচালিত হন। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় প্রশাসক, ধনী ব্যবসায়ী, কৃতী বিজ্ঞানী অথবা কর্মব্যস্ত চিকিৎসক তাঁদের ব্যস্ত জীবনের সময় থেকে সরিয়ে আনা কয়েকটি মুহূর্ত খুব সাধারণ উপন্যাস বা রম্যরচনা পাঠেই খরচ করেন। পাঠকের মানসিকতাও গ্রন্থনির্বাচনে একটি বিশেষ অংশ গ্রহণ করে। একের কাছে সেই গ্রন্থটি দুর্বোধ্য এবং অনাকাঙ্খিত ,অপর পাঠকের কাছে সেই বইটি সহজ এবং কাঙ্খিত বস্তুরূপে প্রতীয়মান হয়। গ্রন্থনির্বাচনে পাঠকের স্বাধীনতাই সর্বাগ্রে। সুতরাং সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রন্থাগার সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী এবং বিভিন্ন রুচির মানুষের কৌতুহলের আকাঙ্খা চরিতার্থতায় নিয়োজিত। এখানেই আধুনিক গ্রন্থাগারের নতুন মূল্য দেখা দিয়েছে। জনসংযোগের বিভিন্ন উপায় সুপ্রচলিত থাকা

সত্ত্বেও গ্রন্থাগার সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ এবং এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসাবে গ্রন্থাগারিক একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী।

সভ্যতার অগ্রগতি শিক্ষাব্যবস্থার অগ্রগতির উপর নির্ভরশীল। মানুষ তার আধ্যাত্মিক, আত্মিক এবং ব্যবহারিক জীবনের উন্নতিসাধনে শিক্ষাকে হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং যেহেতু শিক্ষা মানুষের প্রগতিতে অন্যতম উপাদান হিসাবে স্বীকৃত সেইজন্যই মানুষ শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ও প্রগতিতে সচেতনভাবেই প্রয়াসী। শিক্ষাবিস্তারে গ্রন্থাগারের ভূমিকা গুরুত্ব পেলেও গ্রন্থাগারের উন্নতিতে কিন্তু মানুষ ততখানি সচেষ্ট নয়। তাই শিক্ষাব্যবস্থার আলোকিত জগতে গ্রন্থাগার যেন আঁধারে নিক্ষিপ্ত এক উপেক্ষিতা নায়িকা। সুতরাং এই অবহেলিত এবং উপেক্ষিত গ্রন্থাগারকে স্বীকৃতির আলোর মাধ্যমে তার উজ্জীবিত ভূমিকাকে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। এবং স্বভাবতই গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা,তাঁর সামাজিক মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। গ্রন্থাগারবিহীন শিক্ষাব্যবস্থা যেন নদীহীন প্রান্তরের মতোই রুক্ষ এবং অনুর্বর। এ কথাটি মনে রেখে গ্রন্থাগারের সার্বিক কল্যাণে এগিয়ে আসতে হবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক প্রয়োজনভিত্তিক এবং নির্দিষ্ট সময়সীমায় বিধৃত। কিন্তু গ্রন্থাগার তথ্য গ্রন্থ মানুষের চিরকালের সঙ্গী, চিরায়ত পাথেয়। মানুষের সমাজ জীবনেই গ্রন্থাগারের আলো আঁধারের পরিবেশে হাসি-কান্না, দুঃখ-সুখের এবং পৌষ-ফাগুনের পালার মধ্যেই দোলায়মান। সুতরাং গ্রন্থাগার মানুষের জীবনে হঠাৎ পাওয়া সঙ্গী নয়, সে যেন তার চিরকালের জীবনদেবতা, তার আত্মিক, আধ্যাত্মিক এবং সার্বিক প্রগতির নির্ধারক এবং নিয়ন্ত্রক। সুতরাং শিক্ষাবিস্তারে এবং মানুষের সার্বিক উন্নতিতে গ্রন্থাগারের অবদান অস্বীকার করা যাবে না। সেইজন্যই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমমর্যাদায় তাকে ভুষিত করতে হবে। তথাকথিত শিক্ষা যেখানে শেষ, প্রকৃত শিক্ষাই সেখানে শুরু। তাই তথাকথিত শিক্ষার বন্দর থেকে যেন প্রকৃত শিক্ষার

কর্ণধারের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে। এই সুদূরের চেতনা গ্রন্থাগারিকই দিতে পারেন পাঠকের কানে।

সুতরাং গ্রন্থাগারকে তো মর্যাদা দিতেই হবে কিন্তু তার সামাজিক ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনার অবকাশ থেকেই যায়। সুনাগরিক গঠনে এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অগ্রগমনে বর্তমান জীবনে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব অসীম। তার আনন্দযজ্ঞে শুধুমাত্র ঋত্বিকেরই প্রবেশ অধিকার থাকবে এটা হতে পারে না, সেখানে অনাহুত এবং অবহেলিতকেও স্থান দিতে হবে। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, নির্ধন, সৈনিক বা সংস্কৃতিবান ব্যক্তি সবারই আকাঙ্খা এক অর্থাৎ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে অনেক আহরণ এবং আত্মিক উত্তরণ। এটা সম্ভব কেবলমাত্র উন্নত এবং সুবিন্যস্ত গ্রন্থাগারের মাধ্যমে। গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব যেখানেই থাকুক না কেন তার আলো কিন্তু গ্রন্থাগার সামগ্রীর মাধ্যমে সমাজের দূরতম এবং অন্ধকারময় প্রদেশেও সঞ্চারমান। যেমন জলধারা বিভিন্ন পথে তার প্রবাহে রুক্ষ ভূমিকেও উর্বর করে তোলে, তেমনি গ্রন্থাগারও তার আপন ভাণ্ডার থেকে মানুষের আনন্দ, তৃপ্তি এবং জ্ঞান বিতরণে অজস্র পুস্তক,গ্রন্থাগার সম্পদ ছড়িয়ে দেয় মানুষের রুক্ষ মনের প্রাঙ্গণে। সুতরাং মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বৌদ্ধিক এবং আত্মিক উন্নতিতে গ্রন্থাগারের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরনীয়।

এই প্রসঙ্গে জনগ্রন্থাগারের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। অধিকাংশ উন্নতিশীল দেশে গ্রন্থাগার সীমিতসংখ্যক পাঠকের মধ্যে নিজেকে সঙ্কুচিত করে রাখেনি, সে তার সমস্ত সুযোগ-সুবিধা সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পেরেছে। জনগ্রন্থাগার কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় শিক্ষিত জ্ঞানপিপাসুর মধ্যে নিজেকে সীমায়িত করেনি, সাধারণ মানুষের মধ্যেও সে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পেরেছে। সে জনগণের কল্যাণে, তাদের আনন্দ-বেদনার সাথী হিসাবেই নিজেকে নিয়োজিত রাখে। সাধারণ মানুষকে সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতন করে তোলাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনগ্রন্থাগারের প্রধান কর্তব্যরূপেই বিবেচিত হয়।

কিন্তু জনগণের কল্যাণে যে গ্রন্থাগার নিয়োজিত তার অস্তিত্ব এবং সার্বিক উন্নতিকল্পে সরকারকে তৎপর হতে হবে। যদিও অতীতে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু মানবদরদী ব্যক্তির আন্তরিক প্রচেষ্টায় কিছু উন্নতমানের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু সময়ের বিবর্তনে সেই মানবদরদীদের সংখ্যা এত ক্ষীণ যে প্রগতিশীল সরকারকে জনগ্রন্থাগারের উন্নতিসাধনে এগিয়ে আসতেই হবে। কেননা, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে গ্রন্থাগারই এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা রাজনীতি, সমাজনীতি, এবং সংকীর্ণ ধর্মীয় চেতনার ঊর্ধ্বে এক নিরপেক্ষ ও উদার অস্তিত্বের বাহকরূপে নিজেকে চিহ্নিত করতে পেরেছে। সমস্ত সংকীর্ণ চেতনার ঊর্ধ্বে থেকে জনগ্রন্থাগার যেন তার উদার মনের আমন্ত্রণ পাঠিয়েছে জনমানসের কাছে। সেখানে ধনী, নির্ধন, উচ্চ-নীচ, এবং শিক্ষিত-অশিক্ষিতের বিভেদসীমা মুছে গিয়েছে। সেখানে মানুষ শুধু মানুষ হিসাবে গ্রন্থাগারের এই উদার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারেনি। সুতরাং শুধুমাত্র আনন্দ বিতরণই নয়, শুধু শিক্ষা প্রসারেই নয়, মানুষের মধ্যে সামাজিক চেতনার জাগরণে ও ঐক্যের প্রসারে জনগ্রন্থাগার এক বিশেষ ভূমিকা পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ। এবং পাঠকের মধ্যেও জনগ্রন্থাগারের প্রতি আকর্ষণ এবং কৌতূহল ক্রমেই বেড়ে চলেছে। জনগ্রন্থাগার ছাড়াও আরো কিছু গ্রন্থাগার যেমন শিক্ষাশ্রয়ী গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার এবং বিশেষ ধরণের গ্রন্থাগার সামাজিক দায়িত্ব পালনে এদের ভূমিকাও প্রশংসার দাবী রাখে।

সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তারা বিশেষ কোন ঐতিহাসিক প্রয়োজনে গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশগুলিতে গ্রন্থাগার আজকাল একটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃত। তাই সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রন্থাগারের নতুন মূল্য দেখা দিয়েছে। জনসংযোগের যে কটি উপায় বর্তমানে সুপ্রচলিত তাদের মধ্যে গ্রন্থাগার অন্যতম। প্রসঙ্গত প্রমথ চৌধুরীর একটি উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে—".এদেশে লাইব্রেরির সার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু কম নয় এবং স্কুল ও কলেজের চাইতে কিছু বেশী....আমার বিশ্বাস, শিক্ষা কেউ কাউকে

দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত।....শিক্ষক ছাত্রকে পথ দেখিয়ে দিতে পারেন না।... আমি লাইব্রেরিকে স্কুল কলেজের উপরে স্থান দিই এই কারণে যে, এস্থলে লোকে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে স্বশিক্ষিত হবার সুযোগ পায়, প্রতি লোক তার স্বীয় শক্তি ও রুচি অনুসারে নিজের মনকে, নিজের চেষ্টায় আত্মার রাজ্যে জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।"[১০]

গ্রন্থাগার মানুষকে তার আত্মিক অণ্বেষণের পথনির্দেশ করে যা ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শ্বাস- প্রশ্বাসের মতোই একান্ত জরুরি।

****

১.৩.২ গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান ঃ রবীন্দ্র মননে

বিশ্ব জ্ঞানভাণ্ডারে রবীন্দ্রনাথ এমনই একজন ব্যক্তি, যিনি অনেক বিষয়েই তাঁর সুচিন্তিত মতামত ও সুদূরপ্রসারী বক্তব্য তুলে ধরেছেন। আমাদের চিন্তাভাবনার এমন কোনো দিক নেই যেদিকে রবীন্দ্রনাথের লেখনী চালিত হয়নি এবং পরিচয় নিলে দেখা যায় প্রত্যেকটি দিকে কবির লেখনী যেভাবে চালিত হয়েছে কবির রচনার মূল্য অনুভব করে সেই বিষয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিশে্ষজ্ঞেরও মনে বিস্ময় জাগা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। রবীন্দ্র সাহিত্য ও শিল্পকলার সঞ্জীবনী স্রোতে অবগাহন করে আমরা যে শুধু নতুন জীবনবোধেই উদ্দীপিত হয়ে উঠেছি তাই নয়, মানবতা-বিরোধী অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা ও আমরা পেয়েছি রবীন্দ্র-সম্পদ ভাণ্ডার থেকে। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মানব-জ্ঞান ভাণ্ডারের এমন কোনো শাখা নেই যা রবীন্দ্র প্রতিভায় আলোকিত নয়। স্বভাবতই মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমুদয় ভাণ্ডার যে গ্রন্থাগার তাও তাঁর প্রতিভার আলোকে উদ্ভাসিত। প্রতিভার একটা লক্ষণ হল এই যে, সে বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুকে সংহত করতে পারে। অল্পকথায় বহুকে প্রকাশ করতে পারে। রবীন্দ্র প্রতিভার বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। এ কথার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের অজস্র লেখার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। লাইব্রেরি সম্বন্ধে কবির রচনা তার একটি বিশে্ষ প্রমাণ।

গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে, এর মধ্যে দুটি রচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি হল 'লাইব্রেরি' নামক প্রবন্ধ যা 'বালক' পত্রিকার ১২৯২ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তী কালে তা বিচিত্র প্রবন্ধ এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়টি হল কবির অভিভাষণ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত 'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য'। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনে কবি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন, এবং অভিভাষণটি সেই উপলক্ষে রচিত।স্পষ্টতই রচনা দুটির মধ্যে কালগত ব্যবধান অনেক।

একটি কবির প্রথম যৌবনের রচনা। তখন তাঁর কবি- খ্যাতি উদীয়মান এবং বাংলাদেশের মধ্যেই সীমিত। অন্যটি কবির পূর্ণ বয়সের রচনা। তখন তাঁর খ্যাতি বিশ্বব্যাপ্ত- নোবেল পুরষ্কার দ্বারা অভিনন্দিত।

'লাইব্রেরি' প্রবন্ধটি একটি তত্ত্বমূলক রচনা. গ্রন্থাগারের স্বরূপ, প্রকৃতি এবং তাৎপর্য এখানে রবীন্দ্র প্রতিভার আলোকে উদ্ভাসিত। ভাবতে বিস্ময় লাগে, মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে গ্রন্থাগারের দর্শন সম্পর্কে এই ধরণের একটি তত্ত্বমূলক রচনা এমন নিপুণ কাব্যময় ভাষায় কবি রচনা করেছেন। সমগ্র রচনাটির অন্তর্নিহিত আবেদন ও ভাষার মাধুর্য আমাদের অভিভূত করে। গ্রন্থাগার রবীন্দ্রনাথের জীবনে ছোট বেলা থেকেই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিল।তাই তিনি জীবনস্মৃতিতে লিখছেন— একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করেছে। সেই মেঘলাদিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হয়ে পড়ে একটা স্লেট নিয়ে লিখলাম 'গহন কুসুমকুঞ্জ- মাঝে'। লিখে ভারি খুশি হলাম। তখনই এমন লোককে পড়িয়ে শোনালাম বুঝতে পারবার আশঙ্কা বিন্দুমাত্র যাকে স্পর্শ করতে পারে না। সুতরাং সে গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল বেশ তো, এ তো বেশ হয়েছে। আমার চেয়ে বয়সে বড়ো ঐ বন্ধুটিকে একদিন বললাম সমাজের লাইব্রেরি খুঁজতে খুঁজতে বহুকালের একটি জীর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়েছে ভানুসিংহ নামে কোনো প্রাচীন কবির পদ কপি করে এনেছি। এই বলে তাকে কবিতাগুলি শোনালাম। তিনি ভীষণ বিচলিত হয়ে উঠলেন। বললেন এ পুঁথি আমার চাই। এমন কবিতা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের হাত দিয়ে বার হতে পারত না। আমি এই প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ ছাপবার জন্য অক্ষয়বাবুকে দেব। তখন আমার খাতা দেখিয়ে প্রমান করে দিলাম, এ লেখা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের হাত দিয়ে বের হতে পারে না, কারণ এ লেখা আমার লেখা। বাংলা সাহিত্যে ভানুসিংহের আবির্ভাব এভাবেই হয়েছিল।[১১]

রবীন্দ্রনাথ অতি অল্পবয়সেই হৃদয়াঙ্গম করেছিলেন গ্রন্থাগার এমন একটি জায়গা যেখানে মানুষের অজানা অজ্ঞাত জ্ঞানের আধার রক্ষিত আছে। তাই তিনি 'লাইব্রেরির

মুখ্য কর্তব্য' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন —

"যারা বিশেষভাবে এই সন্ধান করার জন্য লাইব্রেরিতে যাওয়া আসা করে তারা নিজের গরজেই দুর্গমের মধ্যেই একটা পায়ে চলা পথ বানিয়ে নেয়।" [১২]

গ্রন্থাগার এর মাধ্যমে মানুষ নানাভাবে জ্ঞান আহরণ করতে পারে, এবং যেহেতু জ্ঞানই মানুষের মুক্তি অতএব গ্রন্থাগার হল মানুষের পরিত্রান পাবার স্থান। তাই তিনি লিখেছেন— "লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার মধ্যে দাঁড়াইয়া আছি। কোনো পথ মানবহৃদয়ের অতলস্পর্শে নামিয়াছে। যে দিকে ইচ্ছা ধাবমান হও, কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে।"[১৩]

কৈশোর থেকেই গ্রন্থাগারের সাথে রবীন্দ্রনাথের আত্মিক সম্পর্ক। বিলেত যাত্রার আগে তিনি মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমেদাবাদ এর বাসায় কিছুদিন ছিলেন। সে কথা উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখছেন— "একটি বড়ো দেয়ালের খোপে খোপে মেজদাদার বইগুলি সাজানো ছিল। তাহার মধ্যে বড়ো বড়ো অক্ষরে ছাপা, অনেক ছবিওয়ালা একখানি টেনিসনের কাব্যগ্রন্থ ছিল। সেই গ্রন্থটিও তখন আমার পক্ষে এই রাজপ্রাসাদেরই মতো নীরব ছিল। আমি কেবল তাহার ছবিগুলির মধ্যে বার বার করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম। বাক্যগুলি যে একেবারেই বুঝিতাম না তাহা নহে, কিন্তু তাহা বাক্যের অপেক্ষা আমার পক্ষে অনেকটা কু-জনের মতোই ছিল। লাইব্রেরিতে আর—একখানি বই ছিল, যেটি ডাক্তার হেবর্লিন কর্তৃক সংকলিত শ্রীরামপুরের ছাপা পুরাতন সংস্কৃতকাব্যসংগ্রহগ্রন্থ । এই সংস্কৃত কবিতাগুলি বুঝিতে পারা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু সংস্কৃত বাক্যের ধ্বনি এবং ছন্দের গতি আমাকে কতদিন মধ্যাহ্নে অমরুশতকের মৃদঙ্গঘাতগম্ভীর শ্লোকগুলির মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরিয়াছে। ইংরেজিতে নিতান্ত কাঁচা ছিলাম বলিয়া সমস্তদিন ডিকশনারি লইয়া নানা ইংরেজি বই পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিলাম। বাল্যকাল হইতে আমার একটা অভ্যাস ছিল, সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিলেও তাহাতে আমার পড়ার বাধা ঘটিত না।" [১৪]

গ্রন্থাগার যে রবীন্দ্র জীবনে শত ব্যস্ততার মধ্যেও আসন অধিকার করে রেখেছিল

তা দেখতে পাই ১২৯৭ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ যখন রবীন্দ্রনাথ গ্রীষ্মকালে প্রথম শান্তিনিকেতনে পা রেখেছিলেন। এখানেও তাঁর হৃদয় জুড়ে আছে গ্রন্থাগার, তাই তিনি উদীয়মান লেখক প্রমথ চৌধুরীকে লিখছেন— "এখানে আজকাল খুব ঝড়বৃষ্টি বাদলের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। সমস্ত আকাশময় মেঘ করে, অর্থাৎ সমস্ত আকাশটা দেখতে পাওয়া যায়....মাঠের মাঝখানে আমাদের বাড়ি সুতরাং চতুর্দিকের ঝড় এর উপরে এসে পড়ে ঘুরপাক খেতে থাকে বহুকাল এ রকম রীতিমত ঝড় দেখিনি। এখানকার লাইব্রেরিতে একখানা মেঘদূত আছে, ঝড় বৃষ্টি দুর্যোগে রুদ্ধদ্বার গৃহপ্রান্তে তাকিয়ে আশ্রয় করে দীর্ঘ-অপরাহ্নে সেটি সুর করে পড়া গেছে— কেবল পড়া নয়—সেটার উপর ইনিয়ে বিনিয়ে বর্ষার উপযোগী একটা কবিতা লিখেও ফেলেছি।" [১৫]

যে গ্রন্থাগারের কথা রবীন্দ্রনাথ এখানে উল্লেখ করেছেন সেটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই গ্রন্থাগারটিতে ছিল 'এশিয়াটিক সোসাইটি জার্ণাল', 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা','সংস্কৃত গ্রন্থাদি', 'কালিদাসের গ্রন্থাবলী', ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ম্যাক্সমুলার সম্পাদিত 'ঋকবেদ গ্রন্থাদি', এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত 'বিবলিওথিক ইণ্ডিয়া' গ্রন্থমালার বহু গ্রন্থ, কিন্তু এই সময় ছিল প্রাক-ব্রহ্ম-চর্যাশ্রম পর্ব।

এরপরে শান্তিনিকেতনে আশ্রম স্থাপিত হলে আবাসিক বিদ্যালয়ের সাথে সাথে স্থাপন করা হয়েছিল বিদ্যালয় গ্রন্থাগার। শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার স্থাপন করে রবীন্দ্রনাথ থেমে থাকেননি। সেই গ্রন্থাগারে গ্রন্থ সংগ্রহ কিভাবে হবে তাঁর সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর ছিল। রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহের মধ্যে ছিল 'বুকস ফর বাইরাস', 'টোল্ড 'টু দি চিলড্রেন সিরিজ'—যা বিশ্বের নামকরা বইয়ের শিশু সংস্করন। তাদের উপযোগী করে লেখা ও ছাপা আর উপরের শ্রেণীর পাঠকদের জন্য ছিল 'চিলড্রেন ক্লাসিক্স সিরিজ'। বড়দের জন্য ছিল গ্রীক মহাকাব্য 'ইলিয়াড','ওডিসির' অনুবাদ, 'ভার্জিলের তর্জমা' প্রভৃতি বই।

আর কোম্পানীর ক্যানভাসারদের প্রেরণায় কেনা 'হিস্টোরিয়ানস', 'হিস্টরি অব দি ওয়ার্ল্ড', 'দি ওয়ার্ল্ড হিস্টরি', 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব লিটারেচার' বহু খণ্ডে।

'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য' রচনাটি কবির পরিণত বয়সের রচনা। ১৯২৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ দেবার জন্য এই প্রবন্ধটি লেখেন এবং ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় গ্রন্থাগারের পরিষেবা ও পরিচালনা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এই রচনায় কবি গ্রন্থাগারের কি কাজ হওয়া উচিত, কি ভাবে তা সম্পাদিত হবে, গ্রন্থাগারের দায়-দায়িত্ব কি ইত্যাদি বিষয়গুলির তিনি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। মানুষের উপলব্ধির একমাত্র ধারক ও প্রসারযন্ত্র গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার। গ্রন্থের মধ্যে মানুষ অতীতকে বর্তমানে বন্দী করে রাখে, এবং বর্তমানকে ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত করে দেয়। রবীন্দ্র চিন্তায় গ্রন্থের এই স্থিতিশীল অথচ চলমান রূপটি প্রকাশ পেয়েছে।

"মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া ওঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে! হিমালয়ের মাথার উপর কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানবহৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।" [১৬]

গ্রন্থের মধ্য দিয়ে মানুষ নানাভাবে জ্ঞান আহরণ করতে পারে, এবং যেহেতু জ্ঞানই মানুষের মুক্তি অতএব লাইব্রেরি হল মানুষের পরিত্রাণ পাবার স্থান। কবির ভাষায় —

" লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোনো পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোনো পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোনো পথ মানবহৃদয়ের অতলস্পর্শে নামিয়াছে। যে যে-দিকে ইচ্ছা ধাবমান হও, কোথাও বাধা পাইবে না।

মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে।...কত নদী সমুদ্র পর্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া মানবের কণ্ঠ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে— কত শত বৎসরের প্রান্ত হইতে এই স্বর আসিতেছে। এসো, এখানে এসো, এখানে আলোকের জন্মসংগীত গান হইতেছে।" [১৭]

গ্রন্থ নিয়েই গ্রন্থাগার। কিন্তু গ্রন্থের অপরিমেয় শক্তি সম্পর্কে আমরা কতটুকু সচেতন। কবির ভাষায় গ্রন্থের স্বরূপ ও প্রকৃতি ফুটে উঠেছে এইভাবে—

"বিদ্যুৎকে মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে, কিন্তু কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে। কে জানিত সংগীতকে, হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে। কে জানিত মানুষ অতীতকে বর্তমানে বন্দী করিবে !অতলস্পর্শ কাল-সমুদ্রের উপর কেবল এক-একখানি বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে।" [১৮]

গ্রন্থাগারের গ্রন্থসংগ্রহের স্বরূপ কেমন হবে তাও রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমরা জানতে পারি—

"শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শুনা যায়, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে কি হৃদয়ের উত্থান পতনের শব্দ শুনিতেছি। এখানে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির হৃদয় পাশাপাশি এক পাড়ায় বাস করিতেছে। বাদ ও প্রতিবাদ এখানে দুই ভাইয়ের মত একসঙ্গে থাকে; সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে দেহে দেহে লগ্ন হইয়া বাস করে। এখানে দীর্ঘপ্রাণ স্বল্পপ্রাণ পরম ধৈর্য ও শান্তির সহিত জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতেছে, কেহ কাহাকেও উপেক্ষা করিতেছে না।" [১৯]

অর্থাৎ গ্রন্থাগারের সংগ্রহে সব বিষয়ের বই, সব মতের বই, বিভিন্ন আঙ্গিকের বই থাকবে। অনিসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য সব রাস্তাই যাতে খোলা থাকে। এই গ্রন্থসংগ্রহ এমনভাবে করতে হবে যাতে অবান্তর পুস্তক গ্রন্থাগারকে অযথা ভারাক্রান্ত না করে। গ্রন্থ ব্যবহারের উপরেই গ্রন্থাগারের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। কলকাতায় অনুষ্ঠিত

'নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মিলনের' অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসেবে 'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য' অভিভাষণে কবির বক্তব্য হল—

"অধিকাংশ লাইব্রেরিই সংগ্রহবাতিকগ্রস্ত। তার বারো আনা বই প্রায়ই ব্যবহারে লাগে না, ব্যবহারযোগ্য অন্য চার আনা বইকে এই অতিস্ফীত গ্রন্থপুঞ্জ কোণঠাসা করে রাখে। যার অনেক টাকা, আমাদের দেশে তাকে বড় মানুষ বলে; অর্থাৎ মনুষ্যত্বের আদর্শ বিষয় নিয়ে, আশ্রয় নিয়ে নয়। প্রায় সেই একই কারণে বড়ো লাইব্রেরির গর্ব অনেকখানি তার গ্রন্থসংখ্যার উপরে। সেই গ্রন্থগুলিকে ব্যবহারের সুযোগ-দানের ওপরই তার গৌরব প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আপন অহংকার তৃপ্তির জন্য সেটা অত্যাবশ্যক নয়।" [২০]

অর্থাৎ এমন বই দিয়ে গ্রন্থাগার ভরে তুলতে হবে যেগুলি পাঠকের কাজে লাগবে। অকেজো বই চটকদার অথবা নামকরা হলেও যদি ব্যবহারে না লাগে তো শুধু শোভাবর্ধনের জন্য রাখা অর্থহীন, কেননা সব বই সব গ্রন্থাগারের জন্য উপযুক্ত নয়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, গ্রন্থ সংগ্রহের উপযোগিতা কবি কখনো অস্বীকার করেননি। কিন্তু কবির চিন্তায় গ্রন্থ ব্যবহারের মধ্যেই যে গ্রন্থাগারের সার্থকতা সেটা প্রকাশ পেয়েছে।

"লাইব্রেরি তার যে অংশে মুখ্যতঃ জমা করে সে অংশে তার উপযোগিতা আছে, কিন্তু যে অংশে সে নিত্য ও বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত সেই অংশে তার সার্থকতা। লাইব্রেরিকে ব্যবহার্য করতে গেলে লাইব্রেরির পরিচয় সুস্পষ্ট ও সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হওয়া চাই। নইলে তার মধ্যে প্রবেশ চলে না। সে এমন একটা শহরের মতো হয়ে ওঠে যার বাড়ীঘর বিস্তর কিন্তু পথঘাট নেই।" [২১]

বিত্তবান ব্যক্তিরা অনেকেই গ্রন্থ সঙ্কলন করেন বা নিজস্ব গ্রন্থাগার স্থাপন করেন সমাজে নিজের মান ও মর্যাদা বজায় রাখার জন্য, যদিও সেই অমূল্য গ্রন্থসম্ভার তারা খুব কমই ব্যবহার করে থাকেন। এই ধরণের গ্রন্থাগার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী

সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর এই কবিতায় —

"পাষাণ গাঁথা প্রাসাদ পরে আছেন ভাগ্যবন্ত
মেহগিনীর মঞ্চজুড়ি পঞ্চ হাজার গ্রন্থ
সোনার জলে দাগ কাটে না খোলে না কেউ পাতা
আস্বাদিত মধু যেমন যুথী অনাঘ্রাতা,
ভৃত্য নিত্য ধুলা ঝাড়ে যত্ন পুরা মাত্রা,
ওরে আমার 'ছন্দোময়ী সেথায় করবি যাত্রা।"[২২]

অতএব রবীন্দ্র দৃষ্টিতে লাইব্রেরি একটা নিষ্ক্রিয় গ্রন্থ সংকলনের স্থান নয়। তার মধ্যে সক্রিয়তা, সজীবতা থাকবে, থাকবে আহ্বান। শুধু গ্রন্থতালিকা তৈরি করেই গ্রন্থাগারের কাজ শেষ হয় না। পাঠককে সাদর অভ্যর্থনাও জানাতে হবে। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবে বলেছেন—

"যারা বিশেষভাবে বই সন্ধান করবার জন্যে লাইব্রেরিতে যাওয়া-আসা করে তারা নিজের গরজেই দুর্গমের মধ্যেই একটা পায়ে চলা পথ বানিয়ে নেয়। কিন্তু লাইব্রেরির নিজের একটা দায় আছে। সে হচ্ছে তার সম্পদের দায়। যেহেতু তার বই আছে সেইহেতু সেই বইগুলি পড়িয়ে দিতে পারলেই তবে সে ধন্য হয়। সে সক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে না, সক্রিয়ভাবে যেন সে ডাক দিতে পারে।" [২৩]

সক্রিয়তাই লাইব্রেরিকে বড়ো করে। তাই বড়ো লাইব্রেরির সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে—

"যে লাইব্রেরির মধ্যে তার নিজের আগ্রহের পরিচয় পাই, যে নিজে এগিয়ে গিয়ে পাঠককে অভ্যর্থনা করে আনে, তাকেই বলি বদান্য— সেই হল বড়ো লাইব্রেরি— আকৃতিতে নয় প্রকৃতিতে। শুধু পাঠক লাইব্রেরিকে তৈরি করে তা নয়, লাইব্রেরি পাঠককে তৈরি করে তোলে।"[২৪]

আধুনিক গ্রন্থাগার পরিষেবার একটি বিশেষ দিক হল শুধু যান্ত্রিক পদ্ধতিতে গ্রন্থাগার পরিচালনা নয়, গ্রন্থাগারিক ও পাঠকের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের

মাধ্যমে গ্রন্থাগারের পাঠ্য সামগ্রীর উত্তরোত্তর ব্যবহার বৃদ্ধিই হল গ্রন্থাগারের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে পাঠকমণ্ডলী সৃষ্টিই হল গ্রন্থাগারিকের প্রধান কাজ। এই প্রসঙ্গে কবিগুরু লিখেছেন—

"প্রত্যেক লাইব্রেরির অন্তরঙ্গ সভ্য রূপে একটি বিশেষ পাঠকমণ্ডলী থাকা চাই. সেই মণ্ডলীই লাইব্রেরিকে প্রাণ দেয়। লাইব্রেরিয়ান যদি এই মণ্ডলীকে তৈরি করে তুলে একে আকৃষ্ট করে রাখতে পারেন তবেই বুঝব তাঁর কৃতিত্ব। এই মণ্ডলীর সঙ্গে তাঁর লাইব্রেরির মর্মগত সম্বন্ধ স্থাপনের তিনি মধ্যস্থ।অর্থাৎ তাঁর উপর তার কেবল গ্রন্থগুলির নয়, গ্রন্থপাঠকের। এই উভয়কে রক্ষা করার দ্বারা তিনি তাঁর কর্তব্যপালন, তাঁর যোগ্যতার পরিচয় দেন।" [২৫]

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গ্রন্থাগার পরিচালনা, গ্রন্থ সূচীকরণ, বর্গীকরণ, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদির সূচী নির্মাণ, সংযোজিত নতুন গ্রন্থের প্রচার, গ্রন্থ নির্বাচনের কাজ প্রভৃতি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলিতে রবীন্দ্রনাথ স্বচ্ছন্দে অবগাহন করেছেন যার ফলে তাঁর ঐ তত্ত্বের সারবত্তা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের দর্শনকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করেছে।

গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান দুটির মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান এই নতুন বিষয়ের জন্ম হয়েছে। মূলত বিষয়ের অগ্রগতিই ঘটেছে বলা যায়।

তথ্যবিজ্ঞানের বিষয় বস্তুকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় 'বই' ছাড়াও 'অ-বই' বিষয়সমূহ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংগ্রহ, সংগঠন, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও পরিষেবা প্রদানের সঙ্গে উন্নততর প্রযুক্তিবিদ্যার সংমিশ্রণে অনেক বেশি ব্যাপকতর হয়েছে।

সাধারণ প্রতিষ্ঠান থেকে রাজ্য বা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক স্তরে—ক্ষমতায় অধিকার, পুনর্বিন্যাস, দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সামগ্রিক মূল্যায়ণ এবং শিক্ষা ও গবেষণার অগ্রগতিতে সম্যক সহায়তা দানের মাধ্যমে তথ্যবিজ্ঞানের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সুতরাং সর্বস্তরের মানুষ যাতে তথ্যের অধিকার

ও তথ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হয় সে ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তথ্যবিজ্ঞান উন্নততর ব্যবস্থা গ্রহণেরও দিক নির্দেশক। আমরা যদি ভারতবর্ষের শিক্ষাচিত্রের উদাহরণ দিয়ে তথ্যবিজ্ঞানের সীমানাকে দেখি তবে নিশ্চিতভাবেই বলা যেতে পারে প্রথাগত শিক্ষায় তথ্যের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করার সুযোগ অধিকাংশ মানুষের নেই। কিন্তু এরাও তথ্যের ভিত্তিতে স্বাবলম্বী হয়ে জীবনজীবিকা সুচারুভাবে পরিচালন করার অধিকারী। ফলে তথ্য পরিষেবা প্রদানের পদ্ধতিতে এদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে গ্রামোন্নয়নের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা অধুনা বহুল আলোচিত গ্রামীণ বিকাশ ও পুনর্গঠনের বিষয়ে চিন্তাভাবনার প্রেরণা। রবীন্দ্রনাথ প্রথা বহির্ভূত জীবনমুখী শিক্ষাপ্রসারের মধ্য দিয়ে স্বল্পশিক্ষিত ও নিরক্ষর গ্রামবাসীদের সচেনতা বৃদ্ধি ও কুসংস্কার মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন পল্লীপুনর্গঠন বিষয়টি জটিল ও পরস্পর নির্ভরশীল এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, শিক্ষা সবই সামাজিক সমস্যার প্রতিফলন। ফলে সমস্যাগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত করে সমাধানের জন্য সবগুলির মধ্যেই উন্নতিসাধন করা প্রয়োজন।

ফলত, রবীন্দ্রনাথ গ্রাম সংগঠনের কাজে দারিদ্রের সমস্যাকে সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন যা বিভিন্ন সমস্যাকে বহন করে আনে। এই সমস্যাগুলির সমাধানে রবীন্দ্রনাথ পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমবায় মনোভাবের ভিত্তিতে যে প্রকল্পের সন্ধান দেন তার মূল ভিত্তি ছিল তথ্যের ব্যবহার। তথ্য সম্প্রসারণ ও তথ্য সঞ্চারের ফলে যাতে মানুষের জ্ঞানের পরিধির পরিমান বাড়ে, সুশিক্ষিত হয়ে উৎপাদনমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করে গ্রামজীবনের শ্রীবৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশীদার হয় তাই রবীন্দ্রনাথ অনুধাবন করেছিলেন যে গ্রামে জীবন্ত উন্নয়নমুখী যে কোন প্রকল্পকে স্থায়ী ও গতিশীল করার জন্য গ্রামীন গ্রন্থাগার পরিষেবা ব্যবস্থার প্রচলন ও পরিষেবা প্রদানের চেষ্টা থাকা চাই।

তথ্যের ব্যবহার সাধারণ স্তরে পৌঁছে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা রবীন্দ্রনাথের ছিল। কেবল তত্ত্ব প্রদানের মধ্যে সাধারণ মানুষ যাতে তথ্য সমৃদ্ধ হতে পারে তার জন্য

শ্রীনিকেতনে প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি প্রথাবহির্ভুত শিক্ষায় বিশেষ জোর দিয়েছিলেন ১) শ্রীনিকেতনের কাছাকাছি বেশ কয়েকটি গ্রামে নৈশ কালীন বিদ্যালয় স্থাপন ২) নারী শিক্ষার জন্য সুরুল গ্রামের মধ্যে বিদ্যালয় স্থাপন ৩) নারী শিক্ষার জন্য নৈশকালীন বিদ্যালয় পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ বিশ্বভারতীর ১৯২৫ সাল থেকে ১৯৩০ সালের বার্ষিক বিবরণীতে রয়েছে।[২৬]

এই মহিলা বিদ্যালয়গুলিতে কর্মশিক্ষার উপরে জোর দেওয়া হতো। দড়ি তৈরি করা, রান্না শেখা, সেলাই, তাঁত চালানো, বাগান করা, শুশ্রুষা করা প্রভৃতি শিখে নিয়ে আত্নসন্মানিত ও আত্মনির্ভর হওয়ার পথ দেখানো হত।

শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠালগ্নকাল থেকেই লাইব্রেরি পরিষেবা কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। প্রথাগত শিক্ষা ও গবেষণা কাজের উপযোগী লাইব্রেরি ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার বছর দুই আগেই ১৯২৫ সালে স্থানীয় গ্রামের মানুষের জন্য একটি লাইব্রেরি পরিষেবা ব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল শ্রীনিকেতনের পল্লীসংগঠনের গোড়াপত্তনকালে।গ্রামের মানুষের জন্য এই লাইব্রেরি পরিষেবা ব্যবস্থার নাম ছিল 'চলন্তিকা লাইব্রেরি'।[২৭]

গ্রামের মানুষের কথা চিন্তা করে মানুষকে বই এর সান্নিধ্যে আনার জন্য রবীন্দ্রনাথ লাইব্রেরিকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন 'চলন্তিকা লাইব্রেরির' মাধ্যমে। সবার জ্ঞান বিতরণের ব্যবস্থাকে রবীন্দ্রনাথ একত্রীকরণের অন্যতম উপায় বলে মনে করতেন। তাঁর বক্তব্যের মূল সুর ছিল যে, জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় ঐক্য। এই ঐক্যবোধের আনন্দ থেকে কোনো মানুষকেই কোনো কারণেই বঞ্চিত করা উচিত নয়।

গ্রাম সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতির সহায়ক হিসেবে এই গ্রামীন শিক্ষার বিকাশে লাইব্রেরির যে সদর্থক ভূমিকা রয়েছে তা রবীন্দ্রনাথ অনুধাবন করেছিলেন।

দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য শিক্ষাবিস্তারের একান্ত প্রয়োজন এবং এই শিক্ষা বিস্তারের জন্য চাই দেশজোড়া প্রাণবন্ত ও বিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা।

দেশের বিদেশী সরকার যখন দেশে শিক্ষা বিস্তারে উদাসীন- প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করতে অসম্মত তখনই গ্রন্থাগারের দ্বারা কবিগুরু সে কাজ সিদ্ধির উপায় লক্ষ্য করেছিলেন, বুঝেছিলেন—

"সন্মুখে নীলোর্মিমালা ভাঙ্গি পড়ে বেলাবালু পরে,
সূচ্যাগ্র মেদিনী যেন কোনোরূপে জয় নাহি করে;
পশ্চাতে চাহিয়া দেখ, শত ক্ষুদ্র ঘাতে প্রবাহিয়া
শান্ত নীল সিন্ধুবারি চারিদিকে পড়ে ছড়াইয়া।" [২৮]

বিংশশতাব্দীর শেষার্ধে পাশ্চাত্য 'কম্যুনিটি ইনফরমেশন সার্ভিস' এই তত্ত্বের বহুল আলোচনা ও প্রয়োগ ঘটে। তার প্রায় বহু বছর আগেই ভারতবর্ষের বুকে রবীন্দ্রনাথ এই তত্তের জন্ম দিয়েছিলেন এবং বিংশশতাব্দীর প্রথমার্ধে তা বাস্তবে প্রয়োগ করেছিলেন। [২৯]

বিশ্বকবির সৃষ্ট শ্রীনিকেতনে পল্লীসংগঠনে ও উন্নয়নে গ্রন্থাগারের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের শিক্ষাচিন্তার বিকাশ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার মানসিকতা তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের মূল উপাদানসমূহ গ্রন্থ ও তথ্য কেবলমাত্র এক শ্রেণীর মানুষের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সংকুচিত না রেখে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন, স্ত্রী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রত্যেকেই এই রত্নরাজি ভোগ বা ব্যবহার করার অধিকারবোধ অর্জন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করার এই যে তত্ত্ব তা বিশ্বকবির চিন্তাভাবনায় বহুল পরিমাণে ঠাঁই পেয়েছিল এবং তার প্রতিফলন বাস্তব কর্মসূচী প্রণয়ণেও লক্ষ করা যায়। সমগ্র বিশ্বকে পথ দেখাতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। গ্রামীণ লাইব্রেরি পরিষেবা ব্যবস্থার প্রচলনের মাধ্যমে জীবনমুখী শিক্ষা প্রসারের ব্রত রবীদ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন। তাই তো সাধারণ মানুষের আত্মশক্তির সম্যক উদ্বোধনকারী এই বিশ্বকবিকে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানেরই একজন বলে সহজেই অভিহিত করা যায়।

শুধু গ্রন্থাগারই নয়, গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথেও তিনি নিজেকে সংযুক্ত করেছিলেন। ১৯২৫ সালের ২০ ডিসেম্বর কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে অবস্থিত 'আলবার্ট ইনষ্টিটিউট' হলে বঙ্গে গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। এই সম্মেলনে.বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে তাঁর বার্তায় এই বাণী প্রেরণ করেছিলেন যে, এই আন্দোলনকে তিনি আন্তরিকভাবে সমর্থন করেন এবং তাঁর কামনা এই গ্রন্থাগার আন্দোলন উন্নতি ও প্রসার লাভ করুক। এই সম্মেলনে এইদিন 'অল বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন' গঠিত হলেও কালিদাস নাগের আনুকুল্যে অস্থায়ী কার্য্যনির্বাহক সমিতির প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯২৯ সালের বার্ষিক সাধারণ সভায় তিনি পুনরায় সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। ১৯২৮ সালে দ্বিতীয় নিখিলবঙ্গ গ্রন্থাগার সম্মেলনে 'অল বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন' এর নতুন যে কার্য্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয় সেই সমিতির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শুধু রাজ্য স্তরেই নয়, ১৯২৮ সালের ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শারিরিক অসুস্থতার জন্য তিনি সভায় উপস্থিত হতে পারেননি, কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর বিখ্যাত ভাষণ পাঠ করে শোনান হয়— যা বাংলা সাহিত্যে আজও অমূল্য সম্পদ।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করার সময় আদর্শ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন একটি স্বপ্ন 'যত্র বিশ্ব ভবেত্যেকম নীড়ম' সেখানে সমগ্র বিশ্বটাই যেন একটি পাখির নীড়ের মত মনে হবে। রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন গ্রন্থাগারও সেই পাখির নীড়, তাই তিনি বার বার পরম নিশ্চিন্তে গ্রন্থাগারে আশ্রয় নিয়েছেন।

****

১.৩.৩ গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানঃ ব্যবহারিক প্রয়োগ

গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান শিক্ষা জগতের এমন একটি বিষয় যা গ্রন্থাগারের উপাদান বৈচিত্র্য, গ্রন্থাগারের পাঠক, নির্বাচন পদ্ধতি, সংগ্রহ প্রক্রিয়া, সূচীকরণ, বর্গীকরণ, বিষয়বিন্যাস, প্রশাসনিক কর্মধারা, কর্মীবৃন্দ পরিচালনা, গ্রন্থাগার ব্যবহারের রীতিপদ্ধতি এবং সর্বোপরি গ্রন্থাগারের উপাদান সমূহের সংরক্ষণের ব্যাপারে আমাদের জানতে সাহায্য করে। মানব জ্ঞানের যাবতীয় লিখিত, মুদ্রিত এবং অন্যভাবে রক্ষিত উপাদানগুলি সংগ্রহ করা এবং অতীতকালের জ্ঞান বর্তমান কাল ও উত্তরকালের প্রয়োজনে উপযুক্তভাবে সংরক্ষণ করা, মানব প্রজ্ঞা ও প্রয়োজনীয় তথ্য সঞ্চয়কে যথাযথভাবে বিন্যাস করা, উপাদানসমূহের সূচীকরণ, বর্গীকরণ,উপাদানসমূহের সঠিক ব্যবহার ইত্যাদি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিশেষত্ব। বিভিন্ন বিষয়ের উপর গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রয়োগ রয়েছে। বাংলা সাহিত্যেও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের যথেষ্ট প্রয়োগ রয়েছে। প্রাচীনকালের সাহিত্য মহাকাব্য-গীতিকবিতার গরিমাময় প্রকাশ সূক্ষ্ম ও পরিশীলিত পাঠকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সাহিত্যের নবীনতম শাখা উপন্যাস ও ছোটগল্প ,ভ্রমণকাহিনী ও স্মৃতিকথা, প্রবন্ধসাহিত্য ও রম্যরচনা, প্রভৃতি গদ্যসাহিত্যের সৃষ্টি সাহিত্যের বিকাশকে কেবল আধুনিক করে নি, সাহিত্যকে প্রাত্যহিক ব্যক্তিজীবন ও সামগ্রিক সমাজজীবনের প্রতিবিম্ব করে তুলেছে। সাহিত্যে সমাজজীবনের প্রতিচ্ছায়ার এই প্রকাশ সাহিত্যকে সমাজজীবনের নিকটবর্তী করেছে, সমাজজীবনকে সাহিত্যের অন্তর্বর্তী করেছে। গদ্যসাহিত্যের এই বিচিত্র প্রকাশের ফলে বাংলা সাহিত্যেও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নিয়মে সূচীকরণ, বর্গীকরণ, বিষয়ানুযায়ী বিন্যাস, এবং ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য সংরক্ষণে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে ।

****

উল্লেখপঞ্জি

১. Edward Gait, History of Assam, 17th edition, Guwahati, Lawyers Book Stall, 1997, p.260.

২. শ্যামলেশ দাশ, 'শ্রীহট্টের গণভোট ভারত ইতিহাসের কলঙ্ক', কলকাতা, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং, ১৯৯৬, পৃ.-২৩-২৪

৩. নীহাররঞ্জন রায়,'বাঙালির ইতিহাস'(আদিপর্ব),কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃ.-৬৯

৪. মুস্তাকিম আহমদ চৌধুরী, সিলেটের রাজনৈতিক ইতিহাসঃ প্রাচীনকাল থেকে ১৮৫৭, (দীনেশচন্দ্র সরকারের পাল সেলযুগের বংশানুচরিত, পৃ.১০৬ থেকে উদ্ধৃত), বৃহত্তর সিলেটের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, মো.আব্দুল আজিজ ও অন্যান্য সম্পাদিত, সিলেট, ১৯৯৭) পৃ.-৩৯

৫. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালা ইতিহাসের ভগ্নাংশ', 'বঙ্গদর্শন', নবম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮২, পৃ.-৫০

৬. কালীপ্রসন্ন সেন, 'শ্রীরাজমালা', প্রথম লহর, আগরতলা, উপজাতি সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র, ২০০৩, পৃ.-১৮৬

৭. Jayantabhusan Bhattacharjee, Social and Polity formations in Pre-colonial North-East India [Quoted from Rajmala(Tripura Chronicle), NewDelhi, Haranand Publications, 1991, p.125.

৮. Suhas Chatterjee, A Socio-Economic History of South Assam, Jaipur, Printwell Publishers Distributors, 2000, p.1

৯. Economic Survey, Assam 2012-2013, Chapter-II, p.6.

১০. প্রমথ চৌধুরী, 'প্রবন্ধ সংগ্রহ', কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৬১, পৃ.- ১৫০

১১.. অসিতাভ দাশ, 'রবীন্দ্র জীবনে গ্রন্থাগার', গৌতম গোস্বামী সম্পাদিত,'গ্রন্থাগার', কলিকাতা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ২০১২, পৃ.-৩১২

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য', অভ্যর্থনা সমিতির অভিভাষণ, নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মিলন, কলিকাতা, ১৯২৮,

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'লাইব্রেরি', বিচিত্র প্রবন্ধ, ১২৯২, পৃ.-৪৪

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জীবনস্মৃতি', কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৮৮, পৃ.- ৯৫

১৫. অসিতাভ দাশ, 'রবীন্দ্র জীবনে গ্রন্থাগার' , গৌতম গোস্বামী সম্পাদিত, 'গ্রন্থাগার' , কলিকাতা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ২০১২, পৃ.-৩১৩

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ' লাইব্রেরি', বিচিত্র প্রবন্ধ , ১২৯২, পৃ.-৪

১৭. তদেব, পৃ.-৪৫

১৮. তদেব,পৃ.-৪৪

১৯. তদেব, পৃ.-৪৪-৪৫

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য', অভ্যর্থনা সমিতির অভিভাষণ, নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মিলন, কলিকাতা, ১৯২৮,রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার', বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলিকাতা, ১৯৮৮,পৃ.-৩

২১. তদেব, পৃ.-৩

২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ক্ষণিকা', ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, পৃ.-২৩

২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য', অভ্যর্থনা সমিতির অভিভাষণ, নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মিলন, কলিকাতা, ১৯২৮,রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার', বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলিকাতা, ১৯৮৮, পৃ.-৩-৪

২৪. তদেব, পৃ.-৪

২৫. তদেব, পৃ.-৪

২৬. সুবোধ গোপাল নন্দী, রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পিত গ্রাম পুনর্গঠন ও গ্রামীন লাইব্রেরি ব্যবস্থা, অমিতহাজরা সম্পাদিত 'সৃষ্টি'(বিশেষ সংখ্যা), পল্লীসম্প্রসারণ কেন্দ্র, বিশ্বভারতী, ২০০৭, পৃ.- ৪০-৪১

২৭. তদেব, পৃ.- ৪১-৪২

২৮. হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ,'রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার', রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ,কলিকাতা, ১৯৮৮, পৃ.- ২৪

২৯. Biplab Chakrabarti, 'Community Information Science in India and in the West', S.K.Sen, ed.'Politics, Culture and Society', Kolkata, New Age, 2005.

****